‘সত্যি ভ্রমণকাহিনী’ - তে স্বতন্ত্র সতীনাথ

অণ সান্যাল

বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট নাম --- সতীনাথ, সতীনাথ ভাদুড়ী, প্রখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক ফন্মীর রেণুর সম্বোধনে ‘ভাদুড়ীজী’। এক নিশ্বাসে সফল প্রবাসী বাঙালী সাহিত্যিকদের নাম করতে হলে স্বাভাবিকভাবেই স্মরণে আসে সতীনাথের নাম, যিনি ‘জাগরী’ রচনা করে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন -- প্রস্থানের জন্য নয়, স্থানীয় প্রতিষ্ঠার জন্য। তিনি শুধু প্রতিষ্ঠাই পাননি -- হয়ে উঠেছিলেন আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। স্মরণে রাখতে হবে যে ‘জাগরী’ উপন্যাসে স্রষ্টাকে বাঙলী পাঠকরা না জেনেই প্রকাশের মুহূর্ত থেকেই পরম সমাদরে স্বাগত জানিয়েছিল।

সাহিত্যিক সতীনাথ আমজনতার লেখক নন। তিনি প্রকৃতপক্ষে ‘লেখকের লেখক’ --- এমন অভিধায় তিনি আখ্যায়িত হয়ে থাকেন। এটা কোন ভাবেই অমূলক নয়। নিঃসন্দেহে একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক, যিনি অসংখ্য সৃষ্টির ইতিহাস রেখে যাননি বটে, তবে যে, অল্প কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন তা কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে বাঙালির স্থায়ী সম্পদ হয়ে উঠবেই -- একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

বিহারের পূর্ণিয়া জেলার প্রখ্যাত আইনজীবী শ্রী ইন্দুভূষণ ভাদুড়ীর পুত্র সতীনাথ সফলভাবে ছাত্রজীবন সমাপ্ত করেন। এই ছাত্রজীবনে প্রবল উৎসাহ পান মায়ের কাছে, বলা চলে মায়ের স্নেহে সতীনাথ শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। সফল ছাত্রজীবন সমাপ্তির পর, পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি প্রবেশ করেন আইনব্যবসার ক্ষেত্রে, যেখানে তিনি পরিচয় দেন অসাধারণ দক্ষতার। শ্রী সুবল গহেগাপাধ্যায় তাঁর ‘ইতিকথা’ গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

‘মক্কেল ধরা বুদ্ধি তাঁর হয়নি এবং আদর্শবাদী মন এ সব ঘৃণা করত। আইনের সম্বন্ধে সতীনাথের জ্ঞান ছিল গভীর। আইনশাস্ত্রের জটিল মারপ্যাঁচ তিনি সহজেই বুঝতেন এবং তখনকার দুর্ধর্ষ ব্যবহারজীবীরা সতীনাথের কাছে অনেক জটিল তত্ত্ব জেনে নিতেন। তাঁর মেধা এত প্রখর ছিল যে জুনিয়ার উকিল হওয়া সত্ত্বেও জেলা জজেরা ওঁকে ডেকে নানা লিং জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতেন।’

কিন্তু আইনের ব্যবসা তাঁকে চিরকালের জন্য নিশ্চিত জীবনের ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখতে পারেনি, কেননা তিনি দেশ - কাল ও সমাজকে, রাজনীতির আবর্তে আবর্তিত হতে দেখে নিজের নিশ্চিত জীবনাশ্রয় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েন রাজনীতির আবর্তে। এর নেপথ্যে যে কারণটি ছিল তা হল সেই সময় বিদেশী ব্রিটিশ শাসনের বিদ্ধে দেশব্যাপী যে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়েছিল, তাতে অংশগ্রহণ করে এক অনিশ্চিত জীবনপথের পথিক হতে তিনি দ্বিধান্বিত হননি। বিশেষত বিহারে স্বাধীনতা আন্দোলন তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল, তাই আমরা দেখলাম তিনি একদিকে নিঃশব্দ, অন্তর্মুখী, নিস্পৃহ, সংসার - উদাসীন হলেন, অন্যদিকে হলেন রাজনীতির সক্রিয় সংগঠক। বহু মানুষের সুখ দুঃখের প্রকৃত অংশীদার, বক্তৃতায় পারদর্শী, সকলের সঙ্গে মেলামেশায় পটু সতীনাথ রাজনীতির ক্ষেত্রকে আত্মপ্রকাশের স্থান হিসেবে গ্রহণ করলেন। বলা ব

াহুল্য, রাজনীতি তাঁর জীবনপরিধিকে প্রসারিত করেছিল। প্রাসঙ্গিকভাবে বলি, তিনি ব্যক্তিজীবনে নিঃসঙ্গ হলেও জীবনদৃষ্টির গভীরতায় প্রগাঢ় এবং সমাজ ও সমসচেতনতায় সত্যই ঋদ্ধ। মনে রাখতে হবে, সদা পরিবর্তিত জীবনপ্রবাহ ও সমাজ পরিবেশের রূপান্তর ও ভবিষ্যৎ প্রবাহকে তিনি তাঁর সমৃদ্ধ ব্যক্তি অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রত্যক্ষ চেতনা দিয়ে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন। এই সময়েই তিনি একটি দ্বান্দ্বিক সত্যকে ধরতে চেয়েছিলেন; তাঁর বিশ্বাস ছিল যে মানুষ পরিবেশকে বদলায়, আবার পরিবেশ বদলায় মানুষকে। এই সত্যোপলব্ধি তাঁর বিভিন্ন রচনায় ছড়িয়ে আছে।

১৯৩৯ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর সতীনাথ জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। এই যোগদানকে তিনি দেশের প্রতি তাঁর কর্তব্যপালনের পথ বলেই বিবেচনা করেছিলেন। প্রথমে কংগ্রেসে যোগদান করার পর এই দলের বিচ্যুতি দেখে স্যোসালিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন, কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি রাজনীতির অঙ্গন ত্যাগ করেন, কেননা তিনি রাজনীতির ধাঁচে গড়া মানুষ ছিলেন না। রাজনীতি ত্যাগ করলেও এই ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির কাজে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল। তার প্রমাণ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জাগরী'। তিনি 'জাগরী' রচনা করেন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের শাস্তি হিসেবে পাওয়া বন্দী জীবনে--- যে বন্দী - জীবন কাটছিল ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলে। জাগরী রচিত ও প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। বলাবাহুল্য 'জাগরী' উপন্যাসে তৎকালীন ভারতবর্ষের জটিল রাজনীতির পরস্পরবিরোধী চেহারা লক্ষ্য করা যায়। এইভাবে আমরা এক সফল জীবনের অধিকারী সমাজচেতন মানুষের জীবনের তিনটি সুস্পষ্ট অধ্যায় চিহ্নিত হতে দেখলাম ঃ সফল ছাত্রজীবন (১৯২০ - ৩১), উদ্বুদ্ধ রাজনৈতিক কর্মিজীবন (১৩৩৯ - ৪৮) ও তারপরবর্তী সাহিত্যস্রষ্টার জীবন।নিজের বাড়িতে এই সময় থেকেই শু হয় তার আত্ম - প্রকাশের সাধনা।

১৯৪৫ সালে ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি ফিরে এলেন পূর্ণিয়ায় এবং রাজনীতির ঘূর্ণিপাক থেকে মুক্তি পেয়েপ্রবেশ করেন সাহিত্যাঙ্গনে। ১৯৪৮ সালে রাজনীতিকে চিরবিদায় জানিয়ে তিনি লেখনী ধারণ করলেন -- এর পরেই একে একে প্রকাশিত হল 'জাগরী'র পরের গ্রন্থ 'গণনায়ক' -- এটি একটি গল্প সংকলন, প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৫৫, এপ্রিল ১৯৪৮। এই সময়েই তিনি লিখতে শু করেন 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'। যে-গ্রন্থে তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয় পূর্ণিয়াকে প্রায় 'জীবন্ত করে তুললেন'। এই লেখা চলাকালীন তিনি প্রকাশ করেন তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' (ভাদ্র ১৩৫৬, আগষ্ট ১৯৪৯)। এই ছটি উপন্যাসের পর প্রকাশিত উপন্যাস তাঁর অতি প্রিয় 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', প্রথম চরণ, বৈশাখ ১৩৫৬, এপ্রিল ১৯৫৪ আর দ্বিতীয় চরণ প্রকাশিত হয় প্রায় দু-বছর পর জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮, মে ১৯৫১। তবে ক্রম অনুসারে সাজাতে গিয়ে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' -- কেই দ্বিতীয় স্থানদেওয়া হয়।

সাহিত্যিক সতীনাথ জীবনের এই অত্যন্ত ফলপ্রসূ সময়েই তাঁর আবাল্য ইচ্ছা পূরণের আকাঙ্ক্ষা ইউরোপ ভ্রমণের সুযোগ এসে যায়। ১৯৪৯ সালের ১৬ই আগস্ট রওনা হওয়ার কাল থেকে এক বছরের কম সময় ইউরোপের নানা স্থান পরিদর্শনের পর তিনি প্রত্যাবর্তন করেন ১৬ মে ১৯৫০। আর এই সফল ভ্রমণের সার্থক ফসল হিসেবে আমরা পেলাম বাংলায় এক অসাধারণ ভ্রমণ - সাহিত্য। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করি শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদারের কথা। তিনি তাঁর 'সতীনাথ ভাদুড়ী ঃ সাহিত্য ও সাধনা' গ্রন্থে উপন্যাসগুলির পর্ব বিভাগ করতে বসে প্রথম পর্বে তিনটি উপন্যাস 'জাগরী', 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' ও 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' --কে রেখেছেন, দ্বিতীয় পর্বে রেখেছেন 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী'কে। তিনি একটি উপন্যাস বলেই বিবেচনা করেছেন। মন্তব্য করেছেন ঃ

'...সত্যি ভ্রমণ কাহিনী... মেজাজে, বিষয় দৃষ্টিতে তা এক নূতন শ্রেণীর; বিষয়, প্লট, ভাবনা ও রীতিতে অনন্য।'

পরেই আবার মন্তব্য করেছেন ঃ

'কেউ যদি 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী'কে ভ্রমণ কাহিনী বলেন আপত্তি নেই। কিন্তু যদি উপন্যাস না বলেন তবে আপত্তি করব,

যদিও সঙ্কীর্ণ অর্থে উপন্যাস এ নয়।’

কোন বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে লেখকের দেওযা সূত্রের প্রতি আনুগত্য রেখে বলতে পারি --- ‘সত্যি ভ্রমণকাহিনী’ বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের এক স্বর্ণসম্পদ, প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর ১৯৫১ - তে। আমরা এই কাহিনীর নায়ক সতীনাথকে চিনতে আগ্রহী, তাই এই প্রবন্ধপ্রয়াস।

‘জাগরী’ উপন্যাস প্রকাশের পূর্বে যিনি ছিলেন সাহিত্যিক হিসেবে সম্পূর্ণ অপরিচিত, কিন্তু সেটি প্রকাশের পর তিনি হলেন বাংলার অন্যতমস্রষ্টা। তাই পর পর তিনখানি উপন্যাস লেখার পর তাঁর ‘সত্যি ভ্রমণ কাহিনী’ যখন ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হতে লাগল তখনই সাহিত্যরস পিপাসু সাধারণ পাঠকই শুধু তৃপ্ত হননি, সাহিত্যবোদ্ধা ও পণ্ডিতেরা যে দাণভাবে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন, তারই প্রিমাণ আছে আমাদের বাংলার গর্ব ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি চিঠিতে। তিনি লেখেন---

‘আজকাল প্রতি শনিবার ‘দেশ’ পত্রিকার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে থাকি--- আপনার প্যারিস - ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও ফরাসি জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির কথা পড়বার জন্যে। আমি এবং আমারমতন অনেকে মুক্তকণ্ঠে আপনার এই চমৎকার লেখার প্রশংসা করি ও বাঙলায় এ - জিনিস অত্যন্তবিরল।’
এ- বিরলজাতীয়, অভিনব রচনাটি অনেকটা ফরাসি জার্নাল ধরনে রচিত, যাতে আমরা লেখকের অন্তরঙ্গ পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ। এই গ্রন্থটিপাঠের পর বলতেই হয় অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ শক্তি আর অপরিসীম দরদের সংমিশ্রণে এই রচনা শুধু স্বাদুই হয়নি, হয়েছে সাহিত্য ভাণ্ডারের দুলর্ভ রত্ন।

স্মরণে রাখতে হবে, গণআন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সতীনাথ, এক সময় ইউরোপের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে জীবনের রূপ সন্ধানে অত্যাগ্রহী হয়ে উঠলেন, যার ফসল হিসেবে আমরা পেলাম ‘সত্যি ভ্রমণকাহিনী’ --একথা আগেই উল্লেখ করেছি। এ-কাহিনীতে তিনি ইউরোপের চিরস্বীকৃত প্রাণকেন্দ্র ফ্রান্সকে চোখে দেখা ও আন্তরিকভাবে জানায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক গোপাল হালদারের বিশ্লেষণ উল্লেখ্য ঃ

‘এই বই একই কালে তাই ভ্রমণকাহিনী -- চোখ দিয়ে দেখা বিশ্লেষণ, ভাবনার মধ্যে সংগ্রহ, আবার সেই সঙ্গে আপনার মন বুদ্ধি অন্তরকে ফরাসী জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত করে মিলিয়ে নিতে নিতে, সেই দ্বন্দ্ব - মিলনের সংঘাতের মধ্যে দিয়ে আপনাকে আবিষ্কার, আর ফরাসী বা ইউরোপীয় জীবনরূপেরও স্বরূপ উপলব্ধি। সব সুদ্ধ এ গ্রন্থের চরিত্র হচ্ছে --- ট্রব্দব্ধব্তুস্তুস্তু ন্স্‌ন্দ্বব্দব্ধ ড্রব্তুব্জপ্সন্মান্দ্ধ ট্রব্তুপুব্ধব্তুব্জন্দ্ব বা সত্যিকারের ত্মব্দব্দ্রব্ধন্দ্ব ব্ধপ্স ঠ্ব্জ্রুন্তুন্দ্বস্থএকটি নিটোল কাহিনী তাতে আছে, কিন্তু যে কাহিনী ও ভ্রমণকথার দুয়ের টানাপোড়েনে মিলে ‘সত্যি ভ্রমণকাহিনী’ গড়ে উঠেছে -- হয়েছে ত্মব্দব্দ্রব্ধন্দ্ব ব্ধপ্স ঠ্ব্জ্রুন্তুন্দ্বস্থদুটি ব্যাপার মিলিয়ে দেওযা হয়নি -- কিন্তু টানাপোড়েন দুটি পৃথক নয়, একটিঅন্যটির পরিপূরক।’

এবার মূল গ্রন্থটির দিকে দৃষ্টি দিই।

‘সত্যি ভ্রমণকাহিনী’র সূচনাপর্বটি কেমন তারই পরিচয় রয়েছে লেখকের রচনার প্রথম অধ্যায়েই---

‘লিখতে তার ভাল লাগে না। তবু সে হয়ে পড়েছিল একজন লেখক দশচক্রে পড়ে। বড় লেখকযে সে কোনোদিন হতে পারবে না, তাসে জানে, কেননা খুঁটিনাটির উপর তার এত ঝোঁক যে আসল জিনিসটাই যায় কলম এড়িয়ে। ভাল লাগে তার পড়তে, কিন্তু পড়া জিনিসটাকে হজম করার মতো ক্ষমতা বা ধৈর্য তার নেই। তাই জ্ঞানের বদলে তার মনের উপর চেপে তার হাঁফ ধরেনি কোনোদিন --- বরঞ্চ এর ওজন ও পরিধি বাড়ানোর নেশা তার চিরকালের। স্টাইলে ভয় হয়

পেছিয়ে পড়ছে বলে। মনে মনে তার গর্ব যে সে কঠোর যুক্তিবাদী। সব জিনিস স্বাধীনভাবে ভাববার ক্ষমতা তার আছে, কিন্তু কেবল কথা বলবার সময় নয়, নিজে নিজে ভাবতে গেলেও বইয়ে পড়া চিন্তাগুলোর সূত্র ধরেই আসে তার তথ াকথিত নিজস্ব মতামত। সংবাদ সংগ্রহকের সবজান্তা ভাবটা তার আছে পুরোমাত্রায়।'

'সত্যি ভ্রমণকাহিনী'র এই সূচনাপর্বটি পড়ার পর স্বভাবতই প্রথম আমাদের মনে হয় আমরা কোন সতীনাথের সম্মুখীন হল াম? এমন চুলচেরা আত্মবিশ্লেষণ বাংলার লেখক সমাজের মধ্যে দুর্লভ বললেও অত্যুক্তি হয় না। বলে নিই প্রথম পুষে লেখা এই অংশটি আর কারোরই নয় -- স্বয়ং সতীনাথের, তবে দ্বিতীয়াংশে তিনি ডায়েরি লিখেছেন উত্তম পুষে।

একদিকে বড় লেখক হওয়ার গুণ নেই, একথা বলতে যেমন কোন কুণ্ঠা নেই তাঁর, তেমনি মনে মনে গর্ব করার কথা ও তিনি অস্বীকারকরেননি। এই গ্রন্থগুলি পড়লে বলতেই হয় যে এটি একটি সমগ্র বিদেশী সভ্যতার অনুপুঙ্খ বর্ণনা ও বিশ্লেষণ। মূলত স্বদেশের গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপট অতিক্রম করে ইউরোপের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে জীবনের রূপ সন্ধান করেছেন তিনি তাঁর এই 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী'তে। এখানে আত্মআবিষ্কারের প্রয়াসও স্পষ্ট।

যদিও দেশের অভ্যন্তরে তিনি তেমন বিস্তৃতভাবে ভ্রমণ করেননি, কিন্তু ইউরোপের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল যথেষ্ট; তাই প াশ্চাত্য দেশভ্রমণে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। বলা চলে ফরাসী দেশ ও সে দেশের সংস্কৃতির প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরক্তি। তাই লক্ষ্য করা যায় ফরাসী জাতির সামাজিকতার বিচার বিশ্লেষণ করতে বসে সাহিত্যিক সতীনাথ বাঙ্গালীর ম ানসিকতার সঙ্গে ফরাসী মানসিকতার তুলনামূলক আলোচনাতেও প্রবেশ করেছেন। এর নেপথ্যে ছিল সতীনাথের ক্রিয় াশীল মনন ও প্রখর বিচারবুদ্ধি। আসলে বাল্যকাল থেকেই তাঁর ফরাসী দেশের প্রতি যে আকর্ষণ ছিল তা তাঁর কথা থেকেই জেনে নিই। তিনি তাঁর ডায়েরি অংশে লিখেছেনঃ

'ইন্দ্রিয়ের জগতে ফরাসীরা পছন্দ করে সূক্ষ্ম, ফিকে, হাল্কা, মিহি জিনিস, যে জিনিসটা স্থূলদৃষ্টিতে দেখা যায় সেটা সম্বন্ধে এরা নিস্পৃহ, কিন্তু যেটুকু কেবল সূক্ষ্ম - বিশেষজ্ঞের চোখে ধরা পড়ে সেটা সম্বন্ধে সজাগ। ...অগভীর জিনিসের স্থান নেই ফরাসী চিতে। সংযত প্রকাশই চি জ্ঞানের সব চেয়ে বড় কথা। ফরাসী শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা অল্প হাততালিতে অনাসক্ত, ত াই 'মাদাম বোভারি' বই খানা সাতবার লেখা হয়েছিল। 'এদের প্রিয় কার্নেশান কিংবা লাইলাক ফুলের মৃদু সুবাস, প্র াচ্যের কাঁঠালচাঁপা অভ্যস্ত নাকে গন্ধ বলেই বোঝা যায় না। ...ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সূক্ষ্ম দিকটার সূচিমুখ ফ্রান্স। তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ যে কয়দিন আর বাঁচবে, সে কয়দিনপ্যারিসেই থাকবে পৃথিবীর ফ্যাসানের কেন্দ্র। কেবল বেশভূষার ফ্য াসান নয়, লেখার ফ্যাসান, ছবি আঁকবার ফ্যাসান, ভালবাসার ফ্যাসান, ভাববার ফ্যাসান, জীবনটাকে গড়ে তুলবার ফ্য াসান।'

বাংলা সাহিত্যে অনেক সাহিত্যিকই নানা ভ্রমণকাহিনী রচনা করেছেন, এমনকি তাঁদের হাত দিয়ে আমরা বিদেশের কোন কোন স্থানের বর্ণনাও পেয়েছি, কিন্তু নির্দ্বিধায় বলা যায়, একটি দেশ সম্পর্কে এমন পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ প্রায় দুর্লভ। সা হিত্যিক ও ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোল্লিখিত চিঠির এক জায়গায় লিখেছিলেনঃ
'আপনি দেখবার চোখ নিয়ে গিয়েছেন, ভাষাজ্ঞান, ইতিহাস জ্ঞান নিয়ে গিয়েছেন--- ড়ন্দ্ব ভ্রড়প্স ন্ধপ্সন্দ্বব্ধড় ব্ধপ্স ব্ধড়ন্দ্ব ন্দস্তুনন্দ্বব্দ প্পব্তব্দব্ধ ন্তুব্জজব্জন্তু ব্ধড়ন্দ্ব ভ্রন্দ্বব্রপুব্ধড় প্সন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব চস্তুনন্দ্বব্দ ভ্রনব্ধড় ড়নপ্প. একটা সমগ্র বিদেশী সভ্যতার এরকম খুঁটিয়ে বর্ণনা বাঙলায় তো আর দেখিনি।'

এমন সার্থক মন্তব্য একমাত্র ভ্রমণসাহিত্যিক সতীনাথের প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, ফরাসী দেশ সম্পর্কে যে অংশটি আমরা তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি, তা সত্যি ভ্রমণকাহিনীর দ্বিতীয়াংশ,

সেটি হলডায়েরি। একই অধ্যায়ে পাশাপাশি ছটি অংশ উপস্থাপিত বলেও তাদের স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। এই দ্বিতীয়াংশে আমর া পাই এক অন্তরঙ্গসতীনাথকে, যিনি নিজের মনের দরজা যেন আমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এইভাবে উন্মুক্ত দরজা দিয়ে প্রবেশ করার অধিকার তিনি আমাদের দেওয়ায় আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ, তা নাহলে অমরা কখনই স্বতন্ত্র ও অন্তরঙ্গ সতীনাথকে পেতাম না।

'সত্যি ভ্রমণকাহিনী'র দ্বিতীয়াংশ এই ডায়েরিকে একটি বিশিষ্ট সংযোজন বলাই সঙ্গত। দুটির স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তার থেকে লেখকের আনন্দ আহরণের কৌশলটি তারিফ করার মত। আমরা এই ডায়েরি শব্দটি ব্যবহার করতে দেখেছিলাম ভ্রমণরসিক রবীন্দ্রনাথকে -- পশ্চিম দেশভ্রণের বিবরণ প্রদানের জন্য যে গ্রন্থটি তিনি লেখেন তার নাম দেন 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরি'।

ইংরাজি ডডনন্ত্রক্তজন্ত শব্দটি আমরা বাংলা ভাষায় অপরিবর্তিত অবস্থায় গ্রহণ করেছি। ইংরাজি ডডনন্ত্রক্তজন্ত শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বড়ন্দ্ব ত্রড়প্সক্তজব্ধন্দ্বক্ত থ্প্রন্দ্রপ্সক্তজস্ত্ত ডডনন্তব্ধনপ্সত্রক্তজন্ত-তে লেখা হয়েছেত্র স্ত্রনপুন্ত ক্তজন্দ্বন্তপ্সক্তজস্ত্ত প্সন্দ্র ন্দ্বন্দ্ধব্দ প্সন্দ্র ব্ধক্তক্রব্দ্রন্তব্ধনপ্সব্দ,ত্র ন্দপ্সব্তক্তত্রপ্ত, ব্দন্দ্বন্দ্বন্তন্ত্রপ্তপ্তন্তত্র স্ত্রনপুন্ত ক্তজন্দ্বন্তপ্সক্তজস্ত্ত প্সন্দ্র ষ্কব্ধব্ধন্দ্বক্তজব্দত্রন্দ্রন্দ্রন্দ্বন্তব্ধনন্দ্ধ ব্ধড়ন্দ্ব ভ্রক্তজনব্ধন্দ্বক্ত ন্দ্বক্তজব্দপ্সত্রপ্তপ্তন্ত আমরা বাংলায় স্বচ্ছন্দেই একে 'রোজনামচা' বলতে পারি; কেননা ইংরাজিতে বলা হয়েছে স্ত্রনপুন্ত ক্তজন্দ্বন্তপ্সক্তজস্ত্তব্দ প্সন্দ্র ষ্কব্ধব্ধন্দ্বক্তজব্দত্রন্দ্রন্দ্রন্দ্বন্তব্ধনন্দ্ধ ব্ধড়ন্দ্ব ভ্রক্তজনব্ধন্দ্বক্ত ত্নন্দ্বক্তজব্দপ্সত্রপ্তপ্তন্ত । তাহলে বলা চলে ড ায়েরি সেই ধরণের রচনা, যেখানে লেখকের ব্যক্তিগত জীবন জড়িয়ে যায়। চলার পথে এমন অনেক কিছুই ঘটে যা লেখকের ব্যক্তিজীবনকে, জীবনবোধ ও দৃষ্টিকে স্পর্শ করে, অর্থাৎ লেখকের অন্তরঙ্গ পরিচয়টি প্রকাশিত হয়। 'সত্যি ভ্রমণক াহিনী'র এই ডায়েরি অংশে আমরা তাই পাই অন্তরঙ্গ সতীনাথকে, যা প্রথমাংশে সুপ্রকট নয়।

প্যারিসকে কেন্দ্র করে তিনি ঘুরেছিলেন অষ্ট্রিয়া, জার্মানী, ইতালি। প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভিসা না পাওয়ায় তাঁর রা শিয়া যাওয়ার ইচ্ছা পূরণ হয়নি, তাতে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন। এ - সম্পর্কে শ্রীমতি স্বস্তি মণ্ডল তাঁর সতীনাথ সম্পর্কিত গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন ঃ

'কম্যুনিষ্ট আনুগত্য ছিল বলেই তিনি ১৯৪৯-এ ইউরোপ ভ্রমণে গিয়ে রাশিয়া যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাশিয়া সরক ারের আপত্তিতে যাওয়া হয়নি।'

আমরা আরো জানতে পারি পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস হওয়ায় ভ্রমণের তালিকাই শুধু ছোট করতে হয়নি, প্রত্যাবর্তনের তা রিখও এগিয়েনিয়ে আসতে হয়েছে। এসব তথ্যই আমরা পাই ভ্রমণকাহিনীতে; তবে ডায়েরিতে এমন একটি ঘটনার বিবরণ পাই যেখানে সতীনাথের ব্যক্তিজীবন বিশেষভাবে জড়িত। প্যারিসে বসবাসকালে হোটেলে না খেয়ে হোটেলের একটি ঘর নিয়ে স্বহস্তে রান্নার ব্যবস্থা করে তিনি ব্যয়সঙ্কোচ করেন। এই সূত্রেই তিনি পরিচিত হন এক হোটেল - মেডের সঙ্গে, তার ন াম অ্যানি, এই অ্যানি লেখকের মনকে স্পর্শ করে।

প্রাসঙ্গিকভাবে একটি তথ্য আমাদের জানা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় গ্রহণ করলে আমরা দেখি লেখক সতীন াথের জীবনে চার নারীর প্রভাব পড়েছিল--- তাঁদের মধ্যে প্রথম ছিলেন মা। পিতা রাশভারি মানুষ হওয়ায় তিনি পিতার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন, স্নেহময়ী মা-ই ছিলেন তাঁর আশ্রয়। তাঁর প্রেরণাই তাঁর সর্বস্ব। এ সম্পর্কে সুবল গঙ্গোপ াধ্যায় তাঁর 'ইতিকথা' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

''মায়ের মৃত্যুতে সতীনাথ অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন এবং সংসারের প্রতি বন্ধন যেন আরো শিথিল হয়ে যায়। সতীনাথের জীবনে মাতার অভাব বোধ পরবর্তীকালে দুজন মহীয়সী মহিলা পূরণ করেন। এঁরা হলেন কুসুমকুমারী দেবী, এবং পরলে

াকগতা দ্রাক্ষায়মী দেবী -- পূর্ণিয়ার খোকাডাক্তার (অমর ভট্টাচার্য) ও ডাক্তার গোপাল ভট্টাচার্যর মাতা। এই দুজন ম াতৃসমা নারীর স্নেহ ভালবাসায় সতীনাথ মাতৃবিয়োগের ব্যথা ভোলেন। ('অচিন রাগিনী'র এঁদেরই প্রেরণা।')

তাঁর অগ্রজ ভ্রাতা ভূতনাথ ভাদুড়ীর স্ত্রী, তাঁর বৌদির সঙ্গে লেখকের ছিল এক মিষ্টিমধুর সম্পর্ক। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে এই চারজন নারীর ভূমিকা ব্যতীত আর কোনো নারীর কথা আমরা জানতে পারি না। বলা বাহুল্য, তিনি নিজেও এ ব্যাপ ারে আগ্রহী ছিলেন না, কারণ প্রথমে আইনব্যবসা ও পরে রাজনৈতিক জীবনে এমনভাবে জড়িয়ে ছিলেন যে ব্যক্তিগত জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বা অন্যান্য দিক সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। এ - সম্পর্কে 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী'র প্রথম অধ্যায়েই লেখক আমাদের জানান ঃ

'মানুষকে সে ভালবাসত। তার কাজে উৎসাহের প্রেরণা যোগাত তার আশাবাদী মন, পরিবেশে স্বাদ জাগাত নিজের পা ণ্ডিত্যের অভিমানটুকু। তার ভাবপ্রবণ মনে একটা আদর্শবাদিতার মোহ জন্মেছিল ছোটবেলাতেই। এর প্রাবল্যে সংসারধর্ম করবার কথা তার মনের কোনায় উঁকিঝুঁকি মারবার পর্যন্ত সুযোগ পায়নি।'

একথা ঠিক, প্রায় চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত ভাবপ্রবণতা, আদর্শবাদিদের প্রভাবে বৃহত্তর জীবনে কর্তব্যসাধনে তিনি উৎসাহী হয়ে উঠে ব্যক্তিজীবনের চাহিদাকে মূল্য দেননি। কিন্তু যে কোন মানুষ, বিশেষত যাঁরা সৃজনশীল চিন্তাভাবনায় মানুষ তঁ াদের প্রায় সবার জীবনে কখনও এক নারী বা একাধিক নারীর উপস্থিতি স্বাভাবিক। স্নেহে তিনি সিঞ্চিত ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু ভালবাসা ও প্রেমের মূল্যও কোন ব্যক্তিজীবনেই কম নয়। চল্লিশ বছরের ব্যক্তিগত জীবনে প্রায় প্রেম ভালবাসাহীন সতীনাথ যখন এই বিদেশিনী অ্যানির সান্নিধ্যে এলেন, তখনই সে ছুঁয়ে গেল তাঁর মন। আর তখনই স্বভাবতই আমরা পেলাম ব্যক্তি সতীনাথকে, তাকে নিয়ে যে কাহিনী তা নিছক কল্পনাও নয়, গালগল্পও নয় -- এতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন হল -- সাহিত্যিক সতীনাথ কি এই বিদেশিনী নারীর প্রেমে পড়েছিলেন? কেউ কেউ বলেন হ্যাঁ, কেউ কেউ বলেন --- 'ন া'। কারণ হল তাঁর জীবনে তাঁর বৌদি, যাঁর সঙ্গে তাঁর একটি মিষ্টি মধুর সম্পর্ক ছিল, তাঁকেও সতীনাথ এই নারীর সঙ্গে তাঁর ভালবাসার কথা জানাননি। তাই এই দ্বিধা। এখানে অ্যানিকে কেন্দ্র করে লেখক যে কাহিনী রচনা করেছেন তার মধ্যে এক ধরনের নাটকীয়তা আছে; নাটকের যে সূচনা, বিকাশ ও পরিণতি থাকে, তেমনি এ - কাহিনীরও আছে সূচনা, মধ্যাংশ ও শেষাংশ। তবে তা আকস্মিকভাবেই চূর্ণ! অর্থাৎ এ কাহিনী যে - পরিণতিতে পৌঁছবে বলে আমাদের মনে হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত পরিণতি পায়নি -- সার্থক সমাপ্তির আগেই শেষ হয়ে গেছে। পরের অংশে আমরা সেই পরিচয়ই প্রকাশ করব।

আমাদের বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে এমন অনেক ভ্রমণকাহিনী দেখা যায়, যেগুলিতে আকস্মিক ভাবেই প্রেমের এক পর্ব প্রাধান্য পেয়ে যায়। এবং ভ্রমণকাহিনীর বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সেগুলি প্রেমকাহিনীতে পরিণত হয়। সেদিক থেকে বিচার করলে অ্যানিকে নিয়ে লেখকযে কাহিনী বর্ণনা করেছেন সেই কাহিনীতে হৃদয় দেওয়া নেওয়া ব্যাপারটি এক ধরণের আলোছায়াময় অ াস্তরণে আবৃত করে রেখেছেন লেখক; তাই তাঁর ভ্রমণকাহিনী -- ভ্রমণ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সস্তা প্রেমকাহিনীতে পর্যবসিত হয়নি। বলা চলে তিনি ভ্রমণের ছলে ভালবাসার উপন্যাস লেখেননি।'

অনেক পাঠকই প্রশ্ন তুলেছেন যে স্বল্পবাক্, স্বভাবলাজুক ও চাপা এই লেখকের হৃদয়ের এত দিনে দ্ধ দ্বার কি অ্যানি উন্মুক্ত করতে পেরেছিল? কেউ কেউ বলবেন এ-প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন, তবে একটা সত্য স্পষ্ট যে লেখক যে ভাবে এ কাহিনী বয়ন করেছেন এবং ক্রমে ক্রমে তার উন্মোচন ঘটিয়েছেন -- তা এক কথায় অনুভবসাধ্য।

আমরা তাঁর এই কাহিনীর আরো বিশেষ অংশের সঙ্গে পরিচিত হয়ে দেখি, লেখক যখন বিখ্যাত রেনে মোটর গাড়ীর গ্যা

ারেজের কাছে একটি হোটেল মাসিক ভাড়ায় পাওয়া একটি ঘরে এসে উঠলেন তখনই বেশি করে পরিচয় হলো অ্যানির সঙ্গে, অর্থাৎ এখানেই তাঁর প্রথম বিশেষ আলাপ। তাঁর এই ভ্রমণকাহিনীর চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক অ্যানির বর্ণনা করে লিখেছেন ঃ

'কালো চোখ, ছুঁচলো নাক, স্কার্ফ-বাঁধা চুল, গায়ে কাজের এপ্রণ, পায়ে কম্বলের জুতো, হাসিখুসি, কথা আশ্চর্য রকমের স্পষ্ট, উচচারণ ধীর স্থির, কথা বলতে খুব ভালবাসে। এ যুবতী হোটেলের মেড, তার নাম অ্যানি। কথায় কথায় অবাক হয়ে বলে 'ও লালা'। তাকে দেখে লেখকের ভাল লাগে, ভাবেন এর সঙ্গে খানিকটা করে গল্প করলে ফরাসী কথাবার্ত্তা বলা বেশ অভ্যাস হয়ে যাবে।'

এইভাবেই লেখকের সঙ্গে অ্যানির সম্পর্কের সূত্রপাত। যার মধ্যে কোন কপটতা বা ছলনা ছিল না। বোঝা যায় বিদেশে লেখকের বিবর্ণ একাকীত্বকে কিছুটা বর্ণময় করেছিল এই নারী। কেননা লেখকের রচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে এই অ্যানি প্রতিদিন ঘরদোরপরিষ্কার করতে এলে লেখকের মন খুশিতে ভরে যেত। অ্যানিও তাঁকে দেখে হাসত, গল্প করত। ঘরে ঢোকার সময়ে অ্যানির হাতে থাকত এক গোছা চেষ্টনাটের পাতা। হোটেলের ঘরে স্টোভ জ্বালা নিষেধ, তবু অ্যানির উৎসাহে, অ্যানির কিনে আসা স্টোভে লেখক ঘরেই চা তৈরি করতেন। এই ভাবেই ক্রমে ক্রমে অ্যানির সঙ্গে লেখকের একটু ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, সব সময় 'ও লালা' বলায় অভ্যস্ত অ্যানি তাঁর মনে নিঃসন্দেহে কিছুটা রঙ ধরায়। ম্যুসিয়ো সম্বোধন করে অ্যানি লেখকের সঙ্গে নানান গল্প জুড়ে দিত। লেখকের কোন কোন কথা শুনতে হাসিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠত অ্যানি। লেখক এই বই - এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখেছেন ঃ

''হাসির দমকে ফেটে পড়ে অ্যানি। লেখকের খুব ভাল লাগে। পুবোয়া (বক্শিস্) দিতে গেলে অ্যানি তা নিতে অস্বীকার করে--- 'হোটেলের বিলের সঙ্গে শতকরা দশ ফ্রাঁ সার্ভিসের জন্য তো আপনি দিচ্ছেনই মুসিয়ো। আবার কেন? ও লাল া।''

আবার সপ্তম অধ্যায়ে লেখক আমাদের জানিয়েছেন ঃ

'রবিবার ছুটির দিনে লেখক ঘরে থাকতেন না। কিন্তু অ্যানির কাছে হোটেলের মাষ্টার কী থাকা সত্ত্বেও সে লেখককে ঘরে না দেখে ফিরে যেত আর লেখক ফিরে এলে ঘর পরিষ্কারের জন্য ঘরে আসত। লেখক বোঝেন তাঁর সঙ্গে গল্প করতে অ্যা নির ভাল লাগে --- 'সকালের চায়ের চেয়ে এই বোঝাটার স্বাদ কম নয়।'

এমনি ভাবেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লেখকের মনের কাছাকাছি এসে যায় অ্যানি, যার দরদী মনের পরিচয় পেয়ে লেখক অ াপ্লুত। আবার অষ্টম অধ্যায়ে লেখকের বাইরে যাওয়ার উল্লেখ দেখি। লেখক কিছুদিনের জন্য প্যারী ছেড়ে যখন অষ্ট্রিয়া, জার্মানী, ইতালী বেড়াতে যান তখন প্যারী থেকে দূরের অবস্থানকালে তাঁর নানা স্মৃতি স্মরণে আসে। লেখেন ঃ

'মোটকথা প্যারিস ছাড়বার পর থেকেই তার ভাবতে ভাল লেগেছে অ্যানির কথা। নিজের কাছে এ কথা গোপন করে ল াভ নেই... হোটেলের মেডকে ভাল লাগতে পারবে না--- ভাল লাগালাগির আবার নিয়মকানুন আছে নাকি!'

নিজের মনে প্রথম এসেছে, আবার নিজেই তার উত্তর খুঁজে লেখক নিজেকে সমর্থন করেছেন। আসলে অনেক বিচিত্র বিভিন্ন স্মৃতিচিত্রের মধ্যে তাঁর মনের কথাটাও তাঁর নিজের কাছে ধরা পড়েছে।

এখানেই শেষ নয়, অ্যানির ঠিকানা না জানা থাকায় তিনি 'হোটেল দ্য পারী'র ঠিকানায় চিঠি দেন, যদিও পোস্টকার্ডে হে

াটেলওয়ালির নাম লেখার সময় তাঁর মনের ভেতর লুকোনো ছিল অ্যানির না। আবার প্যারী স্টেশনে পৌঁছে তিনি প্রত্য াশা করলেন অ্যানির উপস্থিতি। তাঁর আশা ছিল অ্যানি তাঁকে নিতে আসবেই। অ্যানি আসেনি। যুক্তি সঙ্গত কোন কারণ ন া থাকা সত্ত্বেও লেখকের এই প্রত্যাশা তাঁর মনে অ্যানির স্থানকে স্পষ্ট করে তোলে, কেননা কিছুটা অভিমানের মেঘ লেখকের মনের আকাশে যে জমা হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এইরকমই ঘটনা এর পর দুবার ঘটেছিল। দ্বিতীয়ব ার ঘটেছিল যখন লেখক সুইজ্যারল্যান্ড থেকে প্যারীতে ফিরলেন। সেবারেও লেখক জানতেন অ্যানি আসবে না, তবুও একটা প্রবল প্রত্যাশা তাঁর মনে জমা হয়েছিল। এরপরও আর একবার এই ঘটনা ঘটেছিল যখন তিনি নেপলস্ থেকে প্য ারীতে ফেরেন। বলা বাহুল্য, কোনবারই তাঁর প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। হওয়ার কথাও নয়।

মজার কথা, এই আশাহত মন নিয়ে ডায়েরি লিখতে বসে লেখক যেখানে ফরাসী নারী ও নারীজাতি সম্পর্কে অনেক কথা লিখেছেন। এরপর আমরা দেখি লেখক কিছুদিন ধরে অ্যানিকে এড়িয়ে চলেছেন। কেননা অ্যানির না আসার ঘটনায় লেখকের মনে আঘাত লেগেছিল। আসলে লেখক ছিলেন স্পর্শকাতর। তাই অ্যানির আনা চা খেয়ে তিনি অ্যানিকে নিশ্চ য়ই কিছু কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন। এইভাবেই লেখক খুব নিপুনভাবে ভালবাসার প্রত্যাশা ও স্পর্শকাতর ও মানঅভিম ান স্পষ্ট করে তুলেছিলেন। লেখক সতীনাথের এমন পরিচয় এর আগে আমরা পাইনি।

এখানে আমরা শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদারের বিশ্লেষণের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি। তিনি লিখেছেন ঃ

'কফি তৈরি করা ছিল উপলক্ষ। অমনি লেখকের ক্ষোভটা জল হয়ে যায় দরদে অনুভূতিতে--- 'ব্যাচারি' উদয়াস্ত খাটতে হয় অ্যানিকে, এ দেশের অন্য মেয়েদের মতো কাজে ফাঁকি দিতেজানে না। সত্যি ফরাসী জাতের সত্যিকারের দুহিতা। সে কালচারের প্রতিভূ--- দরদের বশেই লেখকের মন অনেক বেশি এগিয়ে যায়--- হ্যাঁ, লেখকও প্যারিসিয়ান হয়ে উঠছে। কিসের টানে? তা লেখক জানলেও পাঠক বোঝে। এই সময়ে মন বিজ্ঞানের অবচেতনের খেলা বইতেআরও সুক্ষ্ম প্রতীকে দেখা দিতে পারত। এ ক্ষেত্রে অবচেতনের প্রভাব তবু অত দুর্জ্ঞেয় নয়। লেখক টেলিগ্রাম পেল দেশ থেকে - দেশে একটা বড় সাহিত্যিক পুরস্কার সে পেয়েছে। খবর শুনে অ্যানি হেসে চেঁচিয়ে, লেখককে জড়িয়ে ধরে 'ও লালা' বলে কয়েকবার নেচে ছাড়ল। অবস্থাটা চেতনার লোকে তাই স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল হয়।'

এরপর শ্রীহালদার আরো লিখেছেন ঃ

'তবে কি ভাববে লেখকের আপনার লোকেরা -- যে যদি অ্যানিকে নিয়ে দেশে গিয়ে ওঠে, যা ভাববার ভাবুক, অ্যানিকে পেলে লেখক পৃথিবীর অন্য সব ছাড়তে পারে।... লেখক মনস্থির করে প্যারিসে এল। আর দেরী নয়--- সোজা পথ। অ্যা নিকে সে জীবনসঙ্গিনী করে দেশে ফিরে যাবে।'

আমরা জেনেছি --- 'লেখক বেশিদিন অ্যানির সঙ্গে কথা বন্ধ রাখতে পারেননি। তাঁর মন আবার আনন্দে ভরে উঠেছিল-- অ্যানির ''ও লালা' তাঁকে দোলা দিয়েছিল। এই সময় সেই আনন্দের অভিব্যক্তি হিসেবে তিনি তাঁর ডায়েরি লেখেন। ড ায়েরির সেই অংশটি পড়লে আমরা সহজেই বুঝতে পারি তাঁর মন কত গ্রহিষ্ণু, চলিষ্ণু, তাঁর মন কত সজাগ ও উদ্গ্রীব, তাঁর পর্যবেক্ষণ কত গভীর ও ব্যাপক। তাঁর রচনার সমীক্ষাশক্তির সঙ্গে দরদের কি দাণ মিশ্রণ। তাঁর মূল্যায়ন কত যথার্থ। তাঁর মানস প্রস্তুতি কত গভীর। শুধু তাই নয়, তা কত পরিব্যাপ্ত। 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী' না পড়লে এ সব তথ্য আমাদের অজ ানাই থেকে যেত, অজানা থেকে যেত লেখকের চোখে ধরা পড়া ফরাসী জাতি ও প্যারিস শহরটার ব্যক্তিত্বের বর্ণনা। তাই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন -- 'তাঁর দেখার চোখ আছে'।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় এই ডায়েরি অনেক ক্ষেত্রে উপনাসের আদল পেয়ে গেছে।

মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই অ্যানির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে। তিনি তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন। আমরা আগেই উল্লেখ করছি যে অ্যানির মনের সঙ্গে তাঁর মন ক্রমেই জড়িয়ে গিয়েছিল। এই অ্যানি একদিন লেখককে এক অনুরোধ করে বসে ---

'আপনার বইয়ের মধ্যে আমার কথাও লিখতে হবে কিন্তু।'

কিন্তু লেখকের সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল সেইদিন যেদিন রেসকোর্সে তিনি আবিষ্কার করলেন অ্যানি বিবাহিতা। তার স্বামী হল মুকিয়ো লোভ। এমনকি তার সন্তানও আছে। সেই সন্তানের মৃত্যুতে অ্যানি সন্তানকে নিয়ে ইহুদী গির্জায় গিয়ে তাকে কবর দিল। ক্রন্দনরতা অ্যানিকে নিয়ে তার স্বামী ফিরে যাচ্ছে। লেখক এই প্রথম জানলেন অ্যানি ফরাসী মেয়ে নয়, জার্মান, আবার জার্মানই নয় -- সে ইহুদী; ফরাসী কালচারের জন্মগত সন্তান নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে লেখক লিখেছেন ঃ
'অ্যানি ফিরে তাকান লেখকের দিকে। কালোজালের মধ্যে দিয়েও অ্যানির কালো চোখদুটি দেখা যাচ্ছে। ''বুঝেছি, বুঝেছি অ্যানি, -- 'আর বলতে হবে না... তাকানো আর যায় না যে চোখের দিকে -- আর তার কথাটাও অ্যানি নিশ্চয়ই বুঝবে। ... নতুন করে আসা অশ্রুতে অ্যানির চাহনির ব্যঞ্জনা ঢাকা পড়েছে---ও বভোয়া।'

এমনি করে অ্যানির চোখের জলের সঞ্চয় নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন সদাজাগ্রত, স্মৃতিবাহক, স্বপ্নপ্রিয় মনের অধিকারী লেখক সতীনাথ। লেখকের জীবননাট্যের একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল। এই পরিসমাপ্তি কিছুটা ট্রাজিক হলেও কোথাও মেলোড্রামা হয়ে ভ্রমণকাহিনীকে জোলো উপন্যাসে পরিণত করেননি -- এখানেই শিল্পী সতীনাথের মুন্সিয়ানা। 'প্রকৃতপক্ষে সতীনাথের বাইরের পর্যবেক্ষণ ও ভেতরের অন্তর্দৃষ্টি তাঁর ভ্রমণ-- পরিচয়কে সুস্থির করে,... 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী' সতীনাথের জীবনসন্ধানের একটি পদচিহ্' বলে বিদগ্ধজন যে মন্তব্য করেছেন, তা অনস্বীকার্য।

এই ভ্রমণকাহিনী ও ডায়েরি লিখে লেখক আমাদের এক স্বতন্ত্র সতীনাথের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ দিয়ে আমাদের চিরকৃতজ্ঞ করেছেন।

পশ্চিম ইউরোপের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে আগ্রহী হয়ে সফল সাহিত্যিক সতীনাথ যে ভ্রমণকাহিনী রচনা করেছেন, সেই' সত্যিভ্রমণ কাহিনী'র সঙ্গে তুলনীয় আর কোন ভ্রমণকাহিনী আছে কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ সাহিত্য, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রমণ সাহিত্য ও অন্নদাশংকরের 'পথে প্রবাসে' ও সত্যাসত্যর কথা স্মরণে রেখেও বলা যায় সতীনাথ অনেকখানি পরিমাণে স্বতন্ত্র, এই ভ্রমণকাহিনী সতীনাথের আত্মচিত্রও বটে, যেখানে আমরা খুঁজে পাই সূক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্ত, সংস্কৃতিসচেতন ও জীবনশিল্পী সতীনাথকে। এই পাওয়া এক পরম পাওয়া।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com